Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 313–319
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

ঐতিহ্যের নির্মাণে ত্রিপুরার সমাজ-সংস্কৃতি : বহুমাত্রিক উপস্থাপনা

ড. অশোক দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : ashokdasau@gmail.com

Keyword

Abstract
বৃহত্তর বাঙালি এক প্রতিভাশালী জাতি। বস্তুত তার প্রতিভা, নিজস্বতা, আভিজাত্যবোধ বিকশিত হয়েছিল, তার ধর্মীয় চিন্তা ধারা, জাতিবিন্যাস সমাজ গঠনের পাশাপাশি সংস্কৃতির স্বক্রীয়তায়। ভিন্ন ভিন্ন বিচার বিশ্লেষণে দেখা গেছে নৃতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়েও এই প্রতিভাবান জাতি সমগ্র উত্তর ভারতের জাতি সমূহ থেকে পুরোপুরিই আলাদা। এক সময় বাঙালিকে বলা হতো আত্ম-বিকশিত জাতি। সে ভুলে গিয়েছিল, তার প্রাচিন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সেই জন্যই হয়ত বহু বছর পূর্বেই বঙ্কিম আক্ষেপ করে বলেছিলেন বাঙালির নিজস্ব কোন ইতিহাস নেই, আজ আর সে কথা বলার কোন অবকাশ নেই। নানান ব্যক্তিত্ব ও সুধীজনের প্রচেষ্টায় বাংলা ও বাঙালির এক গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়েছে।

উত্তর পূর্ব ভারতের অন্তসীমায় অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর রাজ্যটি হচ্ছে ত্রিপুরা। এ রাজ্যটির উত্তর পূর্বের কিছু অংশ আসামের সঙ্গে সংযোজিত। রাজ্যটির বেশির ভাগ অংশ জুরে আছে প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশ যা তার আন্তর্জাতিক সীমানাকে চিহ্নিত করে। যদিও আসাম রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরার সীমান্ত প্রায় একশ কিলোমিটারের অধিক। প্রাচিন কালে ত্রিপুরার আয়তন আরো বিস্তৃত ছিল। ইংরেজ শাসন ও স্বাধীনতা পরবর্তী দেশভাগ এবং রাজনৈতিক টানাপড়েন রাজ্যটিকে সংকুচিত করেছে। শ্রী কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত 'রাজমালা' বা 'ত্রিপুরার ইতিহাস' গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন 'কিরাত ভুমি' একসময় 'তৃপুরা' আখ্যা প্রাপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে 'ত্রীপুরা' নামে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এই ত্রীপুরা শব্দ থেকেই রুপান্তরিত হতে হতে এসেছে ত্রিপুরা শব্দটি। কৈলাস চন্দ্র সিংহ তার প্রাচীন রাজমালার বর্ণনার প্রেক্ষিত এ বলেছেন,

> "সমগ্র কুকি (লুছাই) প্রদেশ মনিপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকন্ত পার্বত্য প্রদেশে মধ্য ও দক্ষিণ কাছাড়, শ্রীহট্টের দক্ষিনাংশ, ময়মন সিংহের দক্ষিণ পূর্বাংশ সমগ্র নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত হইতেছে।"[১]

স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরার সীমা নির্ধারণের মধ্য দিয়েই এটা প্রতিয়মান হচ্ছে যে এই রাজ্যটির মধ্যে বহুভাষিক মানুষের আচার সংস্কার সংযোজিত হয়েছে। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয় ভাবনার অভিনবত্ব অনেক বেশি গভীরে গ্রথিত হয়েছে। উনিবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে ত্রিপুরাকে পার্বত্য ত্রিপুরা বা 'Hill Tipperah' বলে বিবেচনা করা হত।

অন্যদিকে আবার 'রাজমালা' বা 'ত্রিপুরার' ইতিহাস গ্রন্থের প্রনেতা ত্রিপুরার বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি এই রাজ্যটির প্রাকৃতিক বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন,

"ত্রিপুরার রাজ্য একটি পার্বত্য ও অরন্যময় প্রদেশ ইহার মধ্য দিয়ে ৬/৭ পর্বতশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে ধাবিত হইয়াছে। একটি হইতে অন্য পর্বত শ্রেণী গড়ে ১০/১২ মাইল দূরে অবস্থিত। পর্বত শ্রেণী সমূহের মধ্যে স্থানে স্থানে সুন্দর সমতল ক্ষেত্র ও জলাভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে কণ্ঠক বনের আধিক্য রহিয়াছে।"[২]

প্রত্যেকটি মানব সভ্যতা ও তাঁর সংস্কৃতির উৎস অনুসন্ধান রয়ে গেছে ইতিহাসের উৎস পাঠের মধ্যে। অতিত ইতিহাসের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে এসে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ বর্তমান জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, অতীত কে ছারিয়ে একটি জাতির সংস্কৃতির খোঁজ পাওয়া কঠিন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে অনেক দীর্ঘ প্রশ্নমালা। যদিও ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর একটি বাচন আমাদেরকে ভাবিয়ে রাখে।

"কোন ও জাতি বা মানব সমাজের ইতিহাস হইতেছে তাহার সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস।"[৩]

ত্রিপুরা রাজ্যটি পরিধির তুলনায় ক্ষুদ্র হলেও, এর ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ ও সুপ্রাচীন। রাজপরিবারের যুদ্ধ বিগ্রহ ও ঘাত প্রতিঘাতের প্রসঙ্গ থাকলেও এই রাজ্যটির সমাজ ও সংস্কৃতির মূলে রয়ে গেছে দীর্ঘ অতীত ইতিহাসের পথ পরিভ্রমন। যে ইতিহাস রাজা মহারাজার কথা বল্লেও, সাধারন মানুষকে বাদ দিয়ে নয়।

Discussion

এক

বৃহত্তর বাঙালি এক প্রতিভাশালী জাতি। বস্তুত তার প্রতিভা, নিজস্বতা, আভিজাত্যবোধ বিকশিত হয়েছিল, তার ধর্মীয় চিন্তা ধারা, জাতিবিন্যাস সমাজ গঠনের পাশাপাশি সংস্কৃতির স্বক্রীয়তায়। ভিন্ন ভিন্ন বিচার বিশ্লেষণে দেখা গেছে নৃতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়েও এই প্রতিভাবান জাতি সমগ্র উত্তর ভারতের জাতি সমূহ থেকে পুরোপুরিই আলাদা। এক সময় বাঙালিকে বলা হতো আত্ম-বিকশিত জাতি। সে ভুলে গিয়েছিল, তার প্রাচিন ইতিহাস ও ঐতিহ্য সেই জন্যই হয়ত বহু বছর পূর্বেই বঙ্কিম আক্ষেপ করে বলেছিলেন বাঙালির নিজস্ব কোন ইতিহাস নেই, আজ আর সে কথা বলার কোন অবকাশ নেই। নানান ব্যক্তিত্ব ও সুধীজনের প্রচেষ্টায় বাংলা ও বাঙালির এক গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়েছে।

উত্তর পূর্ব ভারতের অন্তসীমায় অবস্থিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর রাজ্যটি হচ্ছে ত্রিপুরা। এ রাজ্যটির উত্তর পূর্বের কিছু অংশ আসামের সঙ্গে সংযোজিত। রাজ্যটির বেশির ভাগ অংশ জুরে আছে প্রতিবেশি দেশ বাংলাদেশ যা তার আন্তর্জাতিক সীমানাকে চিহ্নিত করে। যদিও আসাম রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরার সীমান্ত প্রায় একশ কিলোমিটারের অধিক। প্রাচিন কালে ত্রিপুরার আয়তন আরো বিস্তৃত ছিল। ইংরেজ শাসন ও স্বাধীনতা পরবর্তী দেশভাগ এবং রাজনৈতিক টানাপড়েন রাজ্যটিকে সংকুচিত করেছে। শ্রী কৈলাস চন্দ্র সিংহ প্রণীত 'রাজমালা' বা 'ত্রিপুরার ইতিহাস' গ্রন্থের শুরুতেই বলেছেন 'কিরাত ভুমি' একসময় 'তৃপুরা' আখ্যা প্রাপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে 'ত্রীপুরা' নামে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এই ত্রীপুরা শব্দ থেকেই রুপান্তরিত হতে হতে এসেছে ত্রিপুরা শব্দটি। কৈলাস চন্দ্র সিংহ তার প্রাচীন রাজমালার বর্ণনার প্রেক্ষিত এ বলেছেন,

"সমগ্র কুকি (লুছাই) প্রদেশ মনিপুরের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকন্ত পার্বত্য প্রদেশে মধ্য ও দক্ষিণ কাছাড়, শ্রীহট্টের দক্ষিনাংশ, ময়মন সিংহের দক্ষিণ পূর্বাংশ সমগ্র নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা ত্রিপুরার অন্তর্গত হইতেছে।"[১]

স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরার সীমা নির্ধারণের মধ্য দিয়েই এটা প্রতিয়মান হচ্ছে যে এই রাজ্যটির মধ্যে বহুভাষিক মানুষের আচার সংস্কার সংযোজিত হয়েছে। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমন্বয় ভাবনার অভিনবত্ব অনেক বেশি গভীরে গ্রথিত হয়েছে। উনিবিংশ শতকের মাঝামাঝিতে ত্রিপুরাকে পার্বত্য ত্রিপুরা বা 'Hill Tipperah' বলে বিবেচনা করা হত।

অন্যদিকে আবার 'রাজমালা' বা 'ত্রিপুরার' ইতিহাস গ্রন্থের প্রনেতা ত্রিপুরার বিভিন্ন বিষয়ের পাশাপাশি এই রাজ্যটির প্রাকৃতিক বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন,

"ত্রিপুরার রাজ্য একটি পার্বত্য ও অরন্যময় প্রদেশ ইহার মধ্য দিয়ে ৬/৭ পর্বতশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে ধাবিত হইয়াছে। একটি হইতে অন্য পর্বত শ্রেণী গড়ে ১০/১২ মাইল দূরে অবস্থিত। পর্বত শ্রেণী সমূহের মধ্যে স্থানে স্থানে সুন্দর সমতল ক্ষেত্র ও জলাভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে কণ্ঠক বনের আধিক্য রহিয়াছে।"[২]

প্রত্যেকটি মানব সভ্যতা ও তাঁর সংস্কৃতির উৎস অনুসন্ধান রয়ে গেছে ইতিহাসের উৎস পাঠের মধ্যে। অতিত ইতিহাসের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে এসে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ বর্তমান জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, অতীত কে ছারিয়ে একটি জাতির সংস্কৃতির খোঁজ পাওয়া কঠিন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে অনেক দীর্ঘ প্রশ্নমালা। যদিও ভাষাবিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর একটি বাচন আমাদেরকে ভাবিয়ে রাখে।

"কোন ও জাতি বা মানব সমাজের ইতিহাস হইতেছে তাহার সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস।"[৩]

ত্রিপুরা রাজ্যটি পরিধির তুলনায় ক্ষুদ্র হলেও, এর ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ ও সুপ্রাচীন। রাজপরিবারের যুদ্ধ বিগ্রহ ও ঘাত প্রতিঘাতের প্রসঙ্গ থাকলেও এই রাজ্যটির সমাজ ও সংস্কৃতির মূলে রয়ে গেছে দীর্ঘ অতীত ইতিহাসের পথ পরিভ্রমন। যে ইতিহাস রাজা মহারাজার কথা বল্লেও, সাধারন মানুষকে বাদ দিয়ে নয়।

দুই

সমাজ ও সংস্কৃতির মূলত একে অন্যের পারিবারিক মানব জীবন ও সমাজের ভাবধারায় তার প্রকাশ ঘটে নানাভাবে। আমাদের দৈনন্দিন চিন্তাধারায়, জীবনের কাজকর্মে ,কর্মপরিকল্পনায় সংস্কৃতির প্রকৃত রূপটি ফুটে উঠেছে। সংস্কৃতির এই প্রসঙ্গটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে এক সমালোচক সুনীতি কুমারের প্রসঙ্গ টেনে লিখেছেন— "ভাষাচার্য ১৯২২ সালে 'culture' এর যথাযথ প্রতিশব্দ হিসেবে 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এর আগে এই অর্থে 'কৃষ্টি' শব্দটি ব্যবহৃত হত, যার উৎস 'কৃষ' ধাতু। সুনীতি কুমার প্যারিসে তাঁর এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর কাছে শুনেছিলেন ওরা 'culture' বা 'civilization' অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দটি ব্যবহার করেন। শিল্প আত্মার সংস্কৃতি, এই প্রশিদ্ধ বক্তব্য রয়েছে ঐতেরেয় ব্রাহ্মণ বইতে। লাতিন 'কালতুরা' (culture) শব্দ থেকে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় 'culture' শব্দটি এসেছে। এর উৎস হল লাতিন 'কোল' ধাতু যার মানে চাষ করা, পুজো ও যত্ন করা। এই অনুষঙ্গে পাওয়া যায়, সযত্ন পরিশীলন, নিরন্তর উৎকর্ষ সাধন"। সংস্কৃতি ও সভ্যতা সুনীতিবাবুর কাছে একে অন্যের পরিপূরক। আসলে সভ্যতার অন্তরের নির্যাস হিসেবে উপস্থিত অথচ বাহ্যিক ভাবে প্রকাশমান উদ্ধত মানবিক বৃত্তটিকেই তো বলা যায় সংস্কৃতি। ভাশাচারজ সভ্যতা তরুর সংস্কৃতি- কুসুমে দেখতে পেয়েছেন সমগ্রের উপস্থিতি।

দীর্ঘ অতীত থেকেই ত্রিপুরায় উপজাতি ও জনগোষ্ঠীর বসবাস। এই জনগোষ্ঠী আবার মঙ্গোল জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা। এরা প্রায় খ্রিষ্ট পূর্ব দুই হাজারের বেশি আগে চীনের ভূমি মাটি ত্যাগ করে ভারতের উত্তর পূর্ব সীমান্ত অবতল সমূহে বসত বাড়ি গড়তে শুরু করে। বস্তুত এই উপজাতির বাসিন্দারাই ত্রিপুরার মূল এবং প্রধান অংশীদার। যদিও পরবর্তী সময়ে মানিক্য রাজাদের অনুকুল্যে বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষেরা ও অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী ত্রিপুরায় বসবাস করতে শুরু করে।

ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ হওয়ার সুবাদে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়ে বহু মানুষ ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা জেলার রায়পুর, নোয়াখালী, চাঁদপুরের সাম্প্রদায়িক হানাহানি, ১৯৪৭ সালের স্বাধিনতা লাভ, এবং পরবর্তীতে একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের মত উত্তাল পরিস্থিতিতে বাঙালিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হল ত্রিপুরা। ফলে ত্রিপুরার মূল আদিবাসি সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দু বাঙালির সংযোগ ঘটিয়ে, তাদের সংস্কার সংস্কৃতির পাশাপাশি তাদের সামাজিক অবস্থানটিকেও সমন্বয়ের দিক থেকে দেখতে হবে। এ সম্পর্কে কিছু বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্বের কথাও আমাদেরকে ভাবিয়ে রাখে :

"আমরা যদি আমাদের রাজ্যের প্রবাহমান সংস্কৃতিক ধারাকে মুল্যায়ন করি তা হলে দেখবো, আমাদের রাজ্যের সংস্কৃতির দুটি মুল ধারা রয়েছে। একটি হলো বাঙালি সংস্কৃতি বা সমতল বাসীদের সংস্কৃতি যাকে আমরা আদিবাসী বা জনজাতি সংস্কৃতি বলতে পারি। বাঙালি সংস্কৃতি বলতে আমরা মূলত হিন্দু বাঙালি এবং মুসলমান সংস্ক্রিতি কেই বুঝবো। এছাড়াও আমাদের রাজ্যে রয়েছে মনিপুরী সাংস্কৃতিক ধারা এবং রয়েছে হিন্দুস্থানী সংস্কৃতি।"[৪]

বস্তুতপক্ষে বৃহত্তর ও বৈচিত্র্যময় ত্রিপুরা রাজ্যের সুদীর্ঘ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিশ্লেষণের সূত্রধরে পর্যবেক্ষণ করলে দৈত্ব ধারাকেই প্রভাবিত হতে দেখা যায়। পাহাড়ি উপজাতি বা আদিবাসি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাঙালি সমাজ সংস্কৃতির ধারা স্রোত। আবার অন্যদিকে পাহাড়ি ও বাঙালি সম্প্রদায়ের লোক মিশ্রনের ফলে এক ধরনের যৌথ সমন্বয় তথা মিশ্র সংস্কৃতির আবহ তৈরি হয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে- ত্রিপুরা ভিন্ন আদি নানান উৎসব অনুষ্ঠান, পূজা- অর্চনা নাম যজ্ঞের মধ্যেও জাতি ধর্মের বিভেদ ভুলে গিয়ে সবাইকে স্বাধীন ভাবে অংশগ্রহন করতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে কিছু মুল্যবান তথ্য দিয়েছেন 'Dances of Festivals of Tripura' গ্রন্থের লেখক :

> "Cultureally conscious, the people of Tripura love to celebrate their own festivals and enjoy the festiily of others too. Major festivals like kharachi, ker, Durga, garia, Bijhu, Id-Uz-Zaha, Ras have been acting as the bride to fill cultural gaps what soevar..."[৫]

এসকল কথাবস্তুর মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করি ত্রিপুরা অঞ্চলের যৌথ ও মিশ্র আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে তার সংস্কৃতিক জগৎ আরো গভীর ভাবে সুদৃঢ় ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

তিন

বৃহত্তর ত্রিপুরা অঞ্চলের বসবাসকারী আদিবাসী জনজাতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার কম বেশি উনিশটি ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি পাহাড়ি জন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ রয়েছে। লেপচা, ছাইমল, ভুটিয়া, খাসিয়া, ভিল, সাঁওতাল, ওরাং, মুন্ডা, গারো, কুকি, উচই, লুসাই, মচা, হালাম, চাকমা, নোয়াতিরা, জমাতিয়া, রিয়াং, তদুপরি ত্রিপুরী তো আছেই। এই সম্প্রদায় গুলোর জীবনযাত্রা, সামাজিক আদান প্রদান প্রায় একই। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যে ব্যতিক্রম নেই তা বলা যায়না। উৎপাদন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে উপজাতি পাহাড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে।

উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেরা, তাদের জীবন জীবিকা তাদের পাহাড়ি অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই। বেঁচে থাকা জীবন ধারনের মূলে রয়েছে ঝুমচাষ কেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। নরনারী প্রত্যেকটি মানুষ একাজের সাথে যুক্ত থাকে। তবে এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়; চাকমা, রিয়াং, জামাতিয়া আর ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে। এই জন গোষ্ঠীর পরিজনেরা হস্ততাঁত নানা বস্ত্র আদি তৈরি করে দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটায়। আবার অর্থ উপার্জনের জন্য বাঁশ ও কাঠ দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সমগ্রী তৈরি করে বাজারে পন্য হিসেবে বিক্রি করে। গৃহপালিত পশু পালন আদিবাসি সম্প্রদায়ের এক পরিলক্ষিত বিষয়।একদিকে এগুলো যেমন আয়ের উৎসকে প্রাধান্য দেয় তেমনি অন্যদিকে সামাজিক আচার অনুষ্ঠান ও বিধি পূজা-পার্বণের উপাচার হিসেবেও এগুলোকেও ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

ত্রিপুরার আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস করার জন্য বাসগৃহ প্রায় একই রকম। যাকে 'টংঘর' হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়ে থাকে। মাটি থেকে খানিকটা উপরে এধরনের ঘর প্রায়শই পাহাড়ি অঞ্চলে দেখা যায়। যাকে প্রস্তুত করার জন্য সাধারনত বাঁশ, খড় ও গাছের প্রয়োজন হয়ে থাকে। তাদের সামাজিক জীবনে এর ব্যবহার যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। তাদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র কাঠ বাস বেত ও মাটি দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। অন্যদিকে এই জন গোষ্ঠীর মানুশের পোষাক-পরিচ্ছেদের মধ্যে তেমন কোন আভিজাত্যের ছাপ নেই। তাদের পোষাক প্রায় একই রকম, সাধারনত মেয়েদের পোষাক অতিসাধারণ ও বাহুল্যবর্জিত। মহিলাদের পোষাকের উপরের অংশকে 'রিঘা' ও নীচের ভাগটিকে 'বিকনাই' বলে অবিহিত করা হয়। যদিও আধুনিকোত্তর সমাজ ব্যবস্থায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজেদের ঐতিহ্যগত পোষাকের অনেক ব্যতিক্রম ঘটে গেছে। আদিবাসী অঞ্চলে মেয়েরা পিতল ও রুপার অলংকার ব্যবহার করলেও বর্তমানে তারা সোনার অলংকার এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। রিয়াং, জামাতিয়া, নোয়াতিয়া ও ত্রিপুরী মেয়েদের মধ্যে অতি জনপ্রিয় অলংকার হচ্ছে টাকার মালা, যাকে তাদের ভাষায় বলা হয়ে থাকে 'রাংবতাং'।

বৃহৎ জন গোষ্ঠীর রাজ্য ত্রিপুরার অন্যতম ভাষা গোষ্ঠীর লোক সম্প্রদায় হচ্ছে মনিপুরী। রাজ্যের মানিক্য শাসনাধীন আমলে রাজ পরিবার ও তার পরিবার বর্গের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হয় মনিপুরীদের সঙ্গে। সমালোচকদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত থেকে জানা যায়, রাজা ভাগ্যচন্দ্রের কন্যা হরিশ্বরীর সাথে ত্রিপুরার রাজা দ্বিতীয় রাজধর মানিক্যের বৈবাহিক সম্পর্ক

স্থাপন হওয়ার সুবাদে মনিপুরী মানুষ ও সমাজ সংস্কারের মধ্যে আদান প্রদানের পথ প্রসস্ত হয়েছে। এই সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ গুলোর মধ্যে দুটি ভাগ পরিলক্ষিত হয় 'বিষ্ণুপ্রিয়া' ও 'মি-তেই'। মনিপুরীরা কোন না কোন ভাবে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের পাশাপাশি রাজ্যে স্বাভাবিক ভাবেই মনিপুরী জাতি সভ্যতার প্রসার ঘটতে থাকে। কৃষিভিত্তিক কাজকর্ম ত্রিপুরার মনিপুরী সম্প্রদায়ের জীবিকা হয়ে থাকলেও, বর্তমানে অনেকেই সরকারি চাকুরী ও ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। মূলত এরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এদের মধ্যে নিজস্ব ভাষা ব্যবহারের রীতি প্রচলিত আছে।

পার্বত্য উপজাতি সমাজ ও পাহাড়ি জনজাতির সম্প্রদায়ের সমানুপাতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, মনিপুরী সম্প্রদায়ের সমাজ সংস্কৃতির একটা নিজস্ব ঘরানা তৈরি হয়েছে। জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সকল ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ধর্মীয় সংগীত সাধারন ভাবেই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। ধর্মপ্রাণ সংগীতপ্রেমী মানুষগুলো ত্রিপুরা অঞ্চলের বৃহত্তর সমাজ- সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সন্দেহাতীত ভাবে বড় ভূমিকা নিয়েছে। মনিপুরী সম্প্রদায়ভুক্ত বসতি পূর্ণ গ্রামে পূজা পার্বণের জন্য যেমন ব্রাহ্মণ এর প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে মৃদঙ্গ বাজনের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে 'ডাকুলা'। সামাজিক শৃঙ্খলা ও অনুশাসন মেনেই এই সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয় ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডপের মধ্যে। নৃত্য শিল্পীদের সম্মান যথেষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয় এই জনসমাজে। এই নৃত্যের কলা-কৌশলে মোহিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে নবনৃত্য সংযোজনের জন্য মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মানিক্যের নিকট আবেদনও করেছিলেন। রবি ঠাকুরের সেই আবেদনে সারা দিয়ে ত্রিপুরার রাজা, মনিপুরের বিশিষ্ট শিল্পী বুদ্ধিমন্ত সিংহ কে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছেন। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ মহারাজকে পত্র লিখেছিল :

> "মহারাজ বুদ্ধিমন্ত সিংহ কে আশ্রমে পাঠিয়েছেন, সে জন্য আমরা আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইয়াছি। ছেলেরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার একটি নাচ শিখিতেছে। আমাদের মেয়েরাও নাচ ও মনিপুরী শিল্পকার্য শিখতে উৎসুক প্রকাশ করিতেছে।"[৬]

চার

ঐতিহ্যগত পরম্পরায় ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসিন্দা না হলেও, বাঙালিদের অবদান এরাজ্যের সংস্কৃতি চর্চায় প্রশ্নাতীত। সময়ের সঙ্গে আপন করে কিংবা বাঁচার প্রশ্নে জীবনকে বাজি রেখে এ রাজ্যে তারা পাড়ি জমিয়েছেন। পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, মহারাজ মহারাজ রত্নমানিক্যের শাসনকালে বাংলার সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনিই রাজকার্যে উন্নতি বিধানের জন্য বেশ কিছু বাঙালি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ করে দেন। এমন কথা উঠে আসে যে, রত্নমানিক্যের সময়কাল থেকেই হিন্দু মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, এমনকি গৌড়েশ্বর এর সম্মতি ও আদেশানুক্রমে তিনি দশ হাজারের মত বাঙালিকে ত্রিপুরা রাজ্যে এনে বসিয়েছিলেন। এই দুই সম্প্রদায়ের আদান প্রদানের মধ্যে বাঙালি সম্প্রদায় যেমন অর্থনৈতিক ও চাষাবাদের ক্ষেত্রে উন্নত হয়েছে, অন্যদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধিতেও তাদের অবদান রয়েছে।নলিনীরঞ্জন রায় চৌধুরীর কথা থেকেও জানা যায় এমন তথ্য :

> "তাঁর আমলেরই বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে ত্রিপুরার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় উপজাতি ভিত্তিক ত্রিপুরা একটি সুসংঘটিত রাজ্য রুপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।"[৭]

ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাজা বিজয় মানিক্য কয়েক হাজার বাঙালি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে, তাদের স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে সময়ের সাথে সাথে সামাজিক প্রয়জনের খাতিরে তাঁতি, কর্মকার, নাপিত, কুম্ভকার, কৈবত, প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত মানুষ জনকে ত্রিপুরায় নিয়ে আসা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান সমাজের কথাও মনে রাখতে হবে। কেননা হাজরাদার, কোচোয়ান, আড্ডাদার ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পেশায় নিযুক্ত লোকেরাও ছিল ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজ। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে মনে রাখতে হবে; দেশভাগ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং বিভেদের রাজনীতির বলি হয়ে বাঙালির চির পরিচিত আকাশ অনেকটাই ধূসর ও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ১৯৪২ এবং ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখা দেওয়ার ফলে, ভিটে মাটি ছেড়ে উদ্বাস্ত বাঙালিদের ঠাই হয় ত্রিপুরা রাজ্য। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্যের কথাও, কারণ তিনিই এই উত্তাল পরিস্থিতিতে উদ্বাস্ত অসহায় বাঙালিদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ভিটে মাটির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ-পাকিস্থান যুদ্ধের সময় বহু হিন্দু বাঙালি ত্রিপুরায় এসে জড় হয়েছিলেন। আর এই ভাবেই বৃহত্তর ত্রিপুরা আদিবাসী অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে যৌথ শিল্পকলার পাশাপাশি আদান প্রদানের ভাবধারায় মিশ্র সংস্কৃতিতে পরিবর্তিত ও রুপান্তরিত হয়ে যায়।

বাঙালি সম্প্রদায়ের জীবন জীবিকা প্রধানত কৃষি নির্ভর হলেও, দেবদেবীর পূজাপার্বণ ও উৎসব বাঙালি সমাজে আছে প্রচলিত। ত্রিপুরা অঞ্চলের বাঙালি বাসিন্দারা প্রধানত, সমতল অঞ্চলে কিংবা নদীর পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বাস করে থাকে। তাদের প্রধান জীবিকা হল কৃষিকাজ। অবশ্য ব্যাবসা বানিজ্য ও চাকুরির মাধ্যমেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। প্রধানত কৃষি নির্ভর হওয়ায় ত্রিপুরার জীবনযাপন অনেকাংশে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। আর এই প্রকৃতিকেই কেন্দ্র করে উদ্ভব ঘটেছে বিভিন্ন দেবদেবীর। এর মধ্যে আছে নবান্ন উৎসব, লক্ষ্মী পুজার মত অনুষ্ঠান। প্রতি বছর ঘরে যখন নতুন ধান প্রবেশ করে তখন সমাজ জীবনে নবান্ন উৎসব পালিত হয়। অন্যদিকে কৃষিকেন্দ্রিক বাঙালি জীবনে ধান রোপণের ঠিক পূর্বে, এবং নতুন ধান পরিপক্ক হয়ে ঘরে তোলার শুরুতে দেবী প্রতিমার পূজা-পাঠ ও আরাধনার রীতি রেওয়াজ বাঙালি সমাজে প্রচলিত। অন্যদিকে কার্তিক মাসে বিশেষত ডোলা সংক্রান্তিতে খড় দ্বারা ডোলা (পুতুল) তৈরি করে দাহ করার এবং কুলায় বাঁশ দিয়ে বার বার আঘাত করে ঘরের চার দিকে প্রদক্ষিণ করার রীতি ও রেওয়াজ বাঙালি সমাজে অতি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত।

দীর্ঘদিন থেকেই ত্রিপুরার জন গোষ্ঠীর একটি বৃহত্তর অংশ জুরে রয়েছে মুসলিম জাতি। অনেকে এমন কথাও বলে থাকেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম মুসলিমদের প্রথম সম্পর্কের সুচনা হয় রত্ন মানিক্যের রাজত্ব কালে। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পরবর্তী স্তরে মহারাজ বীরেন্দ্র মানিক্য মুসলিম ছাত্রদের জন্য উর্দু ও আরবি ভাষার বই পত্রও প্রচলন করেছিলেন। এক ভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনায় সুরেন দেব বর্মণ এমন কথা বলেছেন যে :

> "ত্রিপুরায় বসবাসকারী মুসলমান জনগন অতীতকালে রাজ্যের প্রশাসনিক কাজকর্মে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত না থাকলেও, ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন রাজা বীর বিক্রম মানিক্যের আমলে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান গুরুর পূর্ণ পদে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।"[৮]

এই অঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা বাঙালির অন্তর্ভুক্ত হলেও, তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হিন্দু বাঙালি জনগোষ্ঠী থেকে অনেকটাই ব্যাতিক্রমি।

বহুভাষিক সমাজ সংস্কৃতির জগতে ত্রিপুরা রাজ্যে নেপালি জনভাষা গোষ্ঠীর অবদানও সংযোজিত হয়েছে। অনেকেই মনে করেন মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্যের সময় থেকেই, নেপালি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ত্রিপুরার সম্পর্কের আদান প্রদান হয়। এই সম্প্রদায়ের লোকরা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করে। তাদের সংস্কৃতি চিন্তা ও ভাষা চর্চা ত্রিপুরার রাজপরিবার ও পরিবার বর্গকে বিশেষ ভাবে কাছে টানে। তবে এর সাথে গৌণ ভাবে সংযুক্ত রয়েছে বিহারী, ওড়িয়া ও হিন্দুস্থানি সম্প্রদায়ের মানুষেরা। অন্যদিকে চা বাগিচার শ্রমিকেরা তাদের ভাবনা ও বিশ্বাসে ত্রিপুরার সমাজ ও সংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে এসেছে। এখানে আর একটি কথা বলতেই হয়, এ রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জন-মানসে মন্দিরের মধ্যে নানা দেবদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ধর্মপ্রায় সম্পদায় ও যৌথ মানুষের সমন্বয়ের প্রতীক হচ্ছে এই নিদর্শন। ত্রিপুরা রাজ্যে স্থাপিত মন্দিরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল- উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির, ভুবনেশ্বরী মন্দির, হরিমন্দির, আগরতলার জগন্নাথ মন্দির, কুমার ঘাটের ভবতারিণী মন্দির, ধর্ম নগরের কালীবাড়ি, শিকারীবাড়ির লংতরাই বাবার মন্দির। অন্যদিকে ঊনকোটি বা ছবিমুড়ার পাহারের গায়ে খুদিত রয়েছে দেবদেবী সহ বিভিন্ন মূর্তি ও তার কারুকাজ। এছারা রয়েছে প্রচুর প্রাচিন মসজিদ যা মিশ্র সংস্কৃতি এর সাক্ষ্য বহন করে আছে।

ঐতিহ্যের পরম্পরায় ও সময়ের পথে হাঁটতে হাঁটতে ত্রিপুরার সংস্কৃতি ও সামাজিক মেলবন্ধন আজ বহুস্বরিক ভাবনার ইশারা দেয়। উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি ছোট রাজ্য হলেও এর মধ্যে যে সংস্কৃতি ঐক্যের বন্ধন প্রাচীন ও অটুট তা বারংবার প্রমানিত হয়েছে। অঞ্চলটির বৃহত্তর মানুষ আদিবাসি জনগোষ্ঠীর হলেও, আজ বিকশিত হয়েছে বহুভাষী জনগোষ্ঠীর ঐক্য সূত্রের বন্ধনে। ভাবনা নির্মিতির প্রধান উপজীব্য সময়। এই মহাসময়ের পথে চলতে চলতে কোথায় যেন একটি জনগোষ্ঠী সংযোজনের সীমাকে একটু একটু করে সংযোজিত করে বৃহৎ সংস্কৃতি ও সমাজকে আজ ঐক্য সূত্রে বেঁধে দিয়েছে। বিচ্ছেদের মাঝে মিলনের বার্তাকে আজ নিজস্বতায় প্রতিষ্ঠা দিয়ে এ রাজ্যটি আজ মহাভারতের মিলন তীর্থে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিনিয়ত জিঞ্জসা আর মিমাংসা হয়তো ফুরাবে না কোন দিন। তবু সংস্কৃতি ও সভ্যতা একে অপরের পরিপূরক। বস্তুত, সভ্যতা শুরুর সংস্কৃতি কুসুমে আমরা দেখতে পাই সমগ্রের উপস্থিতি। একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে হলেও এমন কথা স্বীকার করে নিতেই হয় :

"আসলে মিশ্র সংস্কৃতি মানে এই নয় যে শুধু একটি মাত্র সংস্কৃতি এখানে বর্তমান এবং এই সংস্কৃতির বিশাল ধারায় সমস্ত সংস্কৃতি গুলো আত্মবিসর্জন করছে। বিভিন্ন জাতি উপজাতি গোষ্ঠীর বিচিত্র সমারোহে বিভিন্ন জাতি সম্প্রদায়ের স্বাধীন অবস্থানে বহু বিচিত্র ধারায় সংস্কৃতি আপন আপন দিগন্তে বিকশিত, প্রতিটি ধারার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।"[৯]

তথ্যসূত্র :

১. সিংহ, কৈলাস চন্দ্র, প্রাচীন রাজমালা দ্রষ্টব্দ, রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, তৃতীয় অক্ষর সংস্করন, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, ১৪২০, পৃ. ২
২. সিংহ, কৈলাস চন্দ্র, প্রাচীন রাজমালা দ্রষ্টব্দ, রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস, তৃতীয় অক্ষর সংস্করন, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, ১৪২০, পৃ. ৩
৩. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, চতুর্থ প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৪
৪. রায়, দেবব্রত দেব, ত্রিপুরা আদিবাসি সমাজ ও সংস্কৃতি, অক্ষর পাবলিকেশন, দ্বীতিয় মুদ্রন, আগরতলা, ২০১০, পৃ. ১২
৫. Dance and festivals of Tripura, Revised Edition, Department of information, Cultural Affairs & tourism, government of tripura,2010, p. 13
৬. চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ নারায়ণ ও হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পাদনা) রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা, পুনমুদ্রন, ত্রিপুরা মুদ্রনালয়, আগরতলা, ২০১১, পৃ. ৩২৮
৭. রায় চৌধুরী, নলিনী রঞ্জন, মানিক্য শাসনাধীন ত্রিপুরার ইতিহাস, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, (প্রথম প্রকাশ) আগরতলা, ২০১১, পৃ. ৩০
৮. বর্মণ, সুরেন দেব, ত্রিপুরার উপজাতি সংস্কৃতি, জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা, পৃ. ১৫০
৯. শর্মা, অমরেন্দ্র, সংস্কৃতি ভাবনা, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা,২০১১, পৃ. ২৭